বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

মু মুখলেসুর রহমান

বিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণতঃ সরকারী বেসরকারী এই দুই উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সাধারণ কর, বিশেষ কর, সরকারী ভর্তুকি ইত্যাদি সরকারী উৎসের অন্তর্ভুক্ত, অপর দিকে, ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতনসহ আহার, আবাসন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ গৃহীত অর্থ এবং বিভিন্ন দাতব্য ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদান বেসরকারী উৎসের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়। এটা স্বীকৃত যে, যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ কারণে বিগত কয়েক দশকে উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। বিশ্ব ব্যাংকের দেয় তথ্য অনুসারে ১৯৭০ সালে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পৃথিবীব্যাপী যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ২৮ মিলিয়ন, ১৯৯১ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৫ মিলিয়নে। অর্থাৎ বিগত দুই দশকে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিগত দশকগুলোতে যদিও বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সংগত কারণেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সে ব্যয় ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের চাহিদার তুলনায় ছিল অপর্যাপ্ত। এর কারণ হিসাবে এসব দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা (macro-economic condition) ও বিভিন্ন সেক্টরে রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রাপ্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রতিযোগিতাকে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে শিক্ষা সেক্টরে প্রকৃত বরাদ্দ হ্রাস এবং শিক্ষা সেক্টরের বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সাব-সেক্টরে বরাদ্দের ঘাটতির কারণে সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মকভাবে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়তঃ অনেক ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারও উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন খাতে অনাকাংক্ষিত ব্যয়ের পরিমাণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপচয়ের মাত্রাও একেবারে অনুল্লেখ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুকূলে প্রতিবছর রাজস্ব খাত থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার হিংস ভাগই ব্যয় হয় বেতন-ভাতা ইত্যাদি খাতে, আর উন্নয়ন বাজেটেরও প্রায় অর্ধেক ব্যবহৃত হয় ছাত্র/ছাত্রী নিবাস তৈরীসহ অন্যান্য আবাসিক দালান-কোঠা ও ভৌত নির্মাণ কাজে। ফলশ্রুতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার এবং পাঠাগারের অত্যাবশ্যক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ সামগ্রিক উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে। পরিণতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আন্তঃ ও বাহ্যিক দক্ষতা (internal and external efficiencies) বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থেই যার প্রতিকার অত্যাবশ্যক। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, আর্থিক দুরবস্থাকে মোকাবিলার জন্য দু'টি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ প্রথমতঃ ক্রমাবনতিশীল অবস্থাকে রোধ করার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভিন্ন উপায়ে আয় বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবন করা এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক ও অধিকতর পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করতে পারে। এ প্রসংগে, নীচে সম্ভাব্য কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হলো ঃ

আয় বৃদ্ধির উপায় হিসাবে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পেছনে রাষ্ট্রীয় খাত থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এদেশের ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৯৬ সালে শিক্ষার্থী প্রতি সরকারের বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ২৫,৯০৪.৪০ টাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ২১,৪৫২.৬৪ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ২৩,০০২.৬৯ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৩৩,৪৭৩.০৮ টাকা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৬৩,১৯৪.৮৭ টাকা এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৩৬,২২৮.১৪ টাকা। বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায় তা ছিল প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় নগণ্য।

এটা অনস্বীকার্য যে, উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সংক্রান্ত বিষয়টি সমাজের একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর যেসব দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বহুলাংশে ব্যাপৃত, সেসব দেশেও এ সুযোগ সমাজ শ্রেণী নির্ভর। অর্থাৎ, সমাজের অপেক্ষাকৃত বিত্তশীল উচ্চ শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভ করে থাকে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও একটি ক্ষুদ্র অংশ এ সুযোগ লাভে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায়, এটা বলা যায় যে, উচ্চ শিক্ষায় স্বল্প অংকের ছাত্র বেতন যেমন মেধাবী ছাত্র আকর্ষণ করতে সহায়ক নয় তেমনি, এটা ন্যায়বিচারপূর্ণ বা যুক্তিনির্ভরও নয়। কারণ, অনেক দেশে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আহরিত অর্থ তাদের অর্জিত ডিগ্রী বা শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই শিক্ষা কার্যক্রম মূলতঃ দেশের নাগরিকগণের ট্যাক্সের দ্বারা পরিচালিত। অতএব, সমাজের লঘিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে সমগ্র নাগরিকগণের অর্থ ব্যয়ের কোন যৌক্তিকতা আছে মনে হয় না। আবার অপর দিকে বলা যায়, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শিক্ষা ও গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ বা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল্যবান ও সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এই উপকারিতা (benefit) যেহেতু, সামগ্রিক বিবেচনায় শিক্ষা লাভকৃত্ত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপকারের তুলনায় অনেক বেশী কাজেই, দেশের নাগরিকগণকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে ট্যাক্স প্রদান করা উচিত। আবার শিক্ষাকে যদি বিনিয়োগ (investment) হিসাবে গণ্য করা যায়—যার কারণে একজন ব্যক্তি সরাসরি উপকৃত হোন, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কারণ, একজন ব্যক্তি তার অর্জিত ডিগ্রীর বদৌলতে তার সমগ্র জীবনব্যাপী যে আয় এবং উপকার লাভ করে থাকেন তা তার শিক্ষা লাভের ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশী। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন একক ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে একটি সমাজ উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। কাজেই সামগ্রিক বিষয়টিকে ভাবাবেগ দিয়ে না দেখে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা বাস্তবতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একথা বলা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপকার লাভের জন্য এতদ্বসংগে সংশ্লিষ্ট মোট ব্যয়িত অর্থের যুক্তিযুক্ত অংশ (reasonable share) শিক্ষার্থী এবং সমাজের অবশিষ্ট অংশ উভয়ের দ্বারাই পরিশোধিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষা ব্যয় পরিশোধ প্রসংগে শিক্ষার্থী ঋণের বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী ঋণের ধারণাটির জন্ম হয়েছে দু'টি মূলনীতিকে কেন্দ্র করে। প্রথমতঃ মনে করা হয়, যারা একটি সার্ভিস থেকে উপকৃত হোন এর জন্য মুখ্য ব্যয়ভার তাদেরই বহন করা উচিত benefit principle এবং দ্বিতীয়তঃ এ ক্ষেত্রে অধিকতর আয় সম্বলিত ব্যক্তিদেরই প্রাপ্ত সার্ভিসের জন্য অধিকতর ব্যয় ভার বহন করা উচিত ability to pay principle। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদেরই (অভিভাবক নন) সামগ্রিক ব্যয়ের অধিকতর অংশ মেটানো উচিত এবং এর জন্য একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী ঋণ চালুর মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান হতে পারে। সংক্ষেপে যা হচ্ছে, শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জনের পর তা পরিশোধ করবে। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়ন ব্যবস্থা অধিকতর নিরপেক্ষ equitable ও যুক্তিযুক্ত হবে, কারণ, এর মাধ্যমে সমাজের যে কোন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকবে। তবে, এ ব্যবস্থায় সুদের হার অবশ্যই সহনশীল মাত্রায় থাকতে হবে। এছাড়াও গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শিক্ষা ঋণের বিকল্প হিসেবে শিক্ষা কর অথবা গ্র্যাজুয়েট ট্যাক্স-এর বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে যা অষ্ট্রেলিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশে চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাৎসরিক আয়ের একটি অংশ আয় করের অতিরিক্ত হিসেবে শিক্ষা কর অথবা গ্র্যাজুয়েট ট্যাক্স হিসাবে প্রদেয় হতে পারে। এ জাতীয় ট্যাক্স শিক্ষিত বেকার বা আয়বিহীন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে না। গ্র্যাজুয়েট ট্যাক্স প্রাক্তন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থী সবার জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে এবং এর হার অর্জিত ডিগ্রীর ব্যয়ভার ও গৃহীত শিক্ষার স্থিতিকালের বিবেচনায় নির্ধারিত হতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য উপায়েও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আয় বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। প্রথমতঃ প্রাক্তন ছাত্র allumni সমাজে অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে। পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই এ প্রক্রিয়ায় অর্থ উপার্জন করে থাকে। যেহেতু, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রী বা সার্টিফিকেটের বদৌলতে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে উপকৃত হচ্ছে এবং সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদুরপ্রসারী উপকার লাভ করছে সেহেতু, বিনিময়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং, ল্যাবরেটরী ক্লাসরুম নির্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বই-পুস্তক ক্রয়, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে সহায়তা করতে পারেন। আমাদের দেশে অতীতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এ জাতীয় দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ট্যাক্স সুবিধা প্রদানসহ অন্যান্যভাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে এসব জনহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানী বা ফার্ম তাদের পছন্দনীয় বিষয়ের উপর অধ্যয়নশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারে। শর্ত অনুসারে ডিগ্রী লাভের পর ঐসব বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী উক্ত কোম্পানী বা ফার্মের কাজে যোগদানে বাধ্য থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভ্যানিজুয়েলা প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন অনেক কোম্পানী তাদের পছন্দনীয় বিষয়ের উপর অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণত কোর্স সমাপনী বছরগুলোতে এ ধরনের বৃত্তি প্রদানের আগ্রহ ব্যক্ত করে থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ফার্ম বা কোম্পানীগুলোও এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে। এতে বৃত্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন তাদের কাংক্ষিত ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারে অধিকতর সুযোগ পাবে, অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও কিছুটা উপকৃত হবে।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বিদ্যমান মানব সম্পদ ও ভৌত সুযোগ-সুবিধাগুলোকে আরো পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়াসী হতে পারে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ট কোর্স, স্যান্ডউইচ কোর্স চালুর মাধ্যমে আয় বাড়াতে পারে। পৃথিবীর বহু উন্নয়নশীল দেশেই এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নির্দিষ্ট বিষয়াদিতে কন্ট্রাক্ট রিসার্স ও কনসালটেন্সীর মাধ্যমেও আয় বাড়াতে পারে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খাতসহ অংশগ্রহণকারী বিভাগ ও গবেষকগণের মাঝে একটি বিধিসম্মত ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্টন হতে পারে। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনেই সহায়ক নয় বরং এর মাধ্যমে সমাজের বিদ্যমান চাহিদা ও সমস্যাদির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে এবং বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বিদ্যমান অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলোকেও আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপ, খামার, অডিটরিয়াম, অতিথিশালা, কনফারেন্স হল ইত্যাদি বছরের বিভিন্ন সময়ে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।